IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

II বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় স্বদেশচেতনা, মানবতাবাদ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ II

ডঃ সুশান্ত ঘোষ
কোলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

Synopsis:-Birendranath Chattopadhyaya was a prominent poet of modern Bengali Literature, especially post independent and partition of India.He was a protester and faithful to Marxism. He always protests against terrorists, communalist and naxalist.He never compromised any political, social or economic partiality. At his early life he was a politician and an active member of Republican Socialist Party (RSP).He feels common people till now in dark and Marxism couldn't change their life without equality and social reformation. Later he left his political party and rest of the life he sacrifice his life to common people and always protest against partiality, poverty and socio-economic injustice.

(Key word: protester, Socio-economic injustice, Equality, Humanism, partiality, Marxism.)

আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা স্পষ্টবক্তা কবি বোধহয় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।তাঁর কবিতা উদ্দীপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠের বিপ্লবীবার্তায় শাণিত। তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার তরোয়ালের মতোই তিনি তাঁর লেখনী অসি চালনা করেছেন সমসাময়িক শোমাজোবয়বোশঠা, আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক চলমানতার বিরুদ্ধে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতি সুগভীর বিশ্বাস ও পরবর্তীকালে বিশ্বাসভঙ্গের আবহে তাঁর কবিতা বাংলা সাহিত্যে একেবারেই স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী আস্বাদ দান করেছে।কবির কাব্যপ্রেরণার মূল উৎস মানবতাবাদ।তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ রূপান্তরিত হয়েছে সুগভীর মানবতা বোধের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে।এক্ষেত্রে কাজি নজরুল ইসলাম বা সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাথে বেশ কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কেনরা তাঁরাও চেয়েছিলেন মানবতাবাদের প্রতিষ্ঠা তথা প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে এবং প্রতিবাদী বিপ্লবের মধ্যদিয়েই সেই পরাকাষ্ঠা রচনা করেছিলেন।কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মার্ক্সবাদী চেতনায় পচাগলা ধনতান্ত্রিক কদাচার ও রাষ্টনৈতিক অসাম্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সমাজ পুনঃ

নির্মাণ করার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তাঁর কবিতায়।সেদিক থেকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই পথের পথিক।তথাপি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেবল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর কবিতার সীমারেখা টানেননি। তিনি প্রতিবাদ করেছেন নিরাভরণ ভাষায় সম্য,সমগ্র সমাজ তথা ব্যক্তির স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে।কেননা তিনি ঔপনিবেশিক পরিবেশে জন্ম নেওয়া স্বাধীন ভারতের গনতান্ত্রিক পরিবেশের কবি।তিনি যেমন পরাধীন ভারতের গ্রহচ্যুত অসহায় আর্ত দরিদ্র মানুষের ভয়ঙ্কর অবস্থার দৃশ্য অবলোকন করেছিলেন তেমনি প্রতিশ্রুতির সাগরে ফুটে থাকা পদ্মের গোড়াতে যে দূষিত পাঁক স্বাধীন ভারতের সমাজে জমে আছে তাকে তিনি জনসমক্ষে তুলে দেখাতে চেয়েছেন। সেই কারণেই তাঁর কবিতায় প্রতিবাদের ঝাঁঝ অনেক তীক্ষ্ণ ও অর্থপূর্ণ আবেদনবহ। একদা রাজনৈতিক নীতিবাগীশ নেতাদের নীতি সর্বস্বতার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন।কেননা তিনি মনে করতেন মানবসেবার উপরে কখনোই কোনো মতবাদ স্থান পেতে পারেনা।

'ভারতবর্ষ' কবিতায় কবি ভারতবর্ষের আপাত সুন্দর রূপের আড়ালে লুকিয়ে রাখা প্রকৃত ভারতের কঙ্কালসার চেহারাটি তুলে ধরেছেন। অসহায় পীড়িত দারিদ্র লাঞ্ছিত পরিবেশে বেঁচে থাকা আর্ত মানুষের কথা কবিতায় পড়কাষ করেছেন। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে যে আরও এক অসহায় ভারতবর্ষ লুকিয়ে আছে তা দেখে কবি আঁতকে উঠেছেন।স্বার্থপর লোভী ছদ্মবেশী রাজনৈতিক সমাজসেবকের তথাকথিত ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে বিষ উদগীরণ করেছন। যে শ্রমজীবি কৃষক মজদুর ভারতের প্রকৃত শক্তি তাদের প্রতি নেতাদের অবহেলা তিনি মেনে নিতে পারেননি।ক্ষুধায় কাতর আর্ত মানুষের স্বার্থ রক্ষায় তিনি তৎপর হয়েছেন।আর এখানেই দলের সাথে তার দুরত্ব তৈরি হয়।তিনি মনে করেন সমাজের একশ্রেণির ধনাঢ্য ব্যক্তির স্বার্থপরতার জন্য যুদ্ধ হয়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় অতি সাধারন নাগরিকেরা।কবি ইতিহাসের পর্ব থেকে পর্ব ঘুরে দেখেছেন 'কত রাজা আসে যায়'-কেবল তারা ঈর্ষা আর দ্বেষ দিয়ে আকাশ বাতাস বিষাক্ত করে দেয়। কিন্তু ক্ষুধাতুর অনাহারক্লিন্ন দরিদ্র মানুষের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়না।

পৃষ্ঠা-১

কবি তাই ভারতবর্ষের পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের হয়ে প্রতিবাদে শতকণ্ঠ হয়েছেন 'ভারতবর্ষ' কবিতায়।

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে,সারারাত ঘুমুতে পারেনা,
ক্ষুধার জ্বালায় শীতে
কত রাজা আসে যায়,ইতিহাসের ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে,জল কালো করে
বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায় ক্রমে অন্ধকার হয়
চারিদকে ষড়যন্ত্র লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ আসে,পরস্পরের গালে চুমু খেতে খেতে।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'গ্রহচ্যুত' প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে,পরের বছরেই দেখা গেছে ভয়ঙ্কর পঞ্চাশের মন্বন্তর।এই মন্বন্তর ছিল সম্পূর্ণভাবে মানবসৃষ্ট।অমর্ত্য সেন তার গবেষনায় দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ পরিকল্পিতভাবে এই কৃত্রিম মন্বন্বর সৃষ্টি করা হয়েছিল।তারভাষায়-'the 1943 famine can indeed be described as boom famine related to powerful inflationary pressure initiated by public expenditure expansion.' কবি এই দুর্ভিক্ষে লাঞ্ছিত মানুষের ব্যথা বেদনায় সহমর্মী হয়ে উঠেছেন,লোভী স্বার্থপর কিছু মানুষের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি গর্জে উঠেছেন।গান্ধিজীর মতো অবিসংবাদী নেতারা বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটশদের সহযোগিতা করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন।তিনি বলেছিলেন-I am not therefore just now thinking of India's delivarence.but what will be if England and France fall?' যুদ্ধ শেষে তিনি হতাশ হন কেননা যে উদ্দেশ্যে তিনি সমর্থন করতে চেয়েছিলেন তা অধরাই থেকে যায় অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা অধরাই থেকে যায়।

পরবর্তী কালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও পরাধীন ভারতের সেই মূল সমস্যা যথা দারিদ্র ক্ষুধা কর্মহীনতা ইত্যাদি সমস্যাগুলি অবিকল রয়ে গেল কোথায় কোথাও আরও প্রকট হয়ে দেখা দিল পূর্বের তুলনায়।স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গে দেখা দিয়েছিল গভীর ভাদ্য সংকট।বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে যে চরম খাদ্য সংকট দখা দিয়েছিল তা দুর্ভিক্ষের চেয়ে কম কিছু ছিল না। খাদ্যের দাবীতে শান্তিপূর্ণ অবস্থানেও জোণোটাড় উপর নির্বিচারে গুলি চালাণ হোয়েছীল। বামোপোন্থি মতাদর্শে অনুপ্রাণিত কবি সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গর্জে উথেছিলেন।কবি দেখেছেন রাজার পরিবর্তন হলেও রাজনীতির পরিবর্তন হয় না। কেননা যারাই ক্ষমতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের লোভ বিকৃত মানসিকতা প্রভুত্বসুলভ আচরণ,কদাচার মানসিকতার পরিবর্তন হয় না।স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের মতোই স্বাধীনোত্তর ভারতের মাটি কেঁদে আকুল হয় একমুষ্ঠী খাদ্যের জন্য।কবির তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে কবিতার ছত্রে ছত্রে।-

মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে,বাঘের থাবায়
আমাদের ভারতবর্ষ চেনেনা তাদের।
মানে না তাদের পরোয়ানা,
তার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায়
শীতে চারিদিকে প্রচন্ড মারের মধ্যে
আজও ঈশ্বরের শিশু,পরস্পরের সহোদর।

স্বাধীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রের শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।ঐশ্বর্যময়ী ভারতবর্ষের একদিকে ণেটা মন্ত্রীদের জৌলুস প্রাচুর্যের শতদল অন্যদিকে ভারতের প্রকৃত রূপকার শ্রমজীবি কৃষিজীবি মানুষের দারিদ্র মারী ক্ষুধা কবলিত জীর্ণ শীর্ণ অসহায় অবস্থা ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা চিনিয়ে দিয়েছে।পঞ্চাশ কোটি দারিদ্র লাঞ্ছিত অত্যাচারিত বুভুক্ষু ভারতবাসী টাঈ নিয়তিকেই ভরসা করে বেঁচে আছে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে।রাজার পরিবর্তন হলেও তাদের কোনো পরিবর্তন হয়না। তারা চিরকাল বৈষম্যের শিকার হয়েই বেঁচে থাকে।কবি সহোদর শব্দটি ব্যবহার করেছেন সাম্যবাদের শব্দান্তর হিসাবে।কারণ ভারত আমাদের দেশমাতা হলে সকলেই তো তার সন্তান প্রত্যেকেই তো সহোদর।তাহলে কেনো কীছু স্বার্থপর নেতা মন্ত্রী আখের গোছানোর জন্য সাধারণ সহোদর জনতাকে বলি দিতেও পিছপা হয়না।

পৃষ্ঠা-২

এ শোষণ চলতে পারেনা।কবি মার্ক্স এর দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।শোষনমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের দায়বদ্ধতা থেকে কবি সাধারণ বঞ্চিত নাগরিকদের পাশে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার করেছেন বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের। খাদ্যে ভেজাল মেশানোর দাবী তুলে তৎকালীন সরকার আড়তদার,মজুতদার দের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে খাদ্য আমদানী ও সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। খাদ্যের হাহাকারে নিরন্ন মানুষের আর্তনাদে কলকাতার রাজপথ হয়েছিল মুখরিত ও রক্তাক্ত। কবির উপলব্ধি করেছিলন স্বাধীনতা সবার জন্য সমান হয়ে আসেনি।এই স্বাধীনতা ছিল বৈষম্যের স্বাধীনতা।জঠরের ক্ষুধা সহ্য করে স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদ করা অসম্ভব।ক্ষুধাতুর মানুষের কাছে পোড়া বাসি ভেজাল এসব করে খাদ্য সংকট তৈরি করে বিশুদ্ধ খাবার দান করার স্বপ্ন অলীক শুধু নয় অসম্ভব বটে।কবি বলতে চেয়েছেন আগে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করার ব্যবস্থা করা দরকার।তারপর ভেজাল খাদ্য রোধে খাদ্য আমদানী বন্ধ করা উচিত।যদিও প্রতিটি নাগরিকের অধিকার আছে বিশুদ্ধ খাবার পাবার এবং একমাত্র রাষ্ট্রই পারে বিশুদ্ধ খাদ্যের যোগান দিতে।কেননা আইন প্রশাসন সঠিকভাবে পরিচালিত হলে এ সমস্যা দূরীভূত হতে পারে।কবি লিখেছেন।–

হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশানো রুটি
তবুও তো জঠরে বহ্নি নেভানো খাঁটি,
এ এক মন্ত্র রুটি দাও রুটি দাও
বদলে বন্ধু যা ইচ্ছা নিয়ে যাও।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে বুভুক্কু মানুষের ফ্যান দাও আর্ত চিৎকারে কোলকাতার আকাষ বাতাস ব্যথাতুর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।কবি কাজী নজরুল একদা বলেছিলেন 'ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ,চায় দুটো ভাত একটু নুন' সুকান্ত ভট্টাচার্য দেখেছিলেন 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়', কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একমুঠো খাদ্যের জন্য সবকিছু দিয়ে দিতে চান।এমনকি প্রিয়ার চোখের মনি স্বাধীনতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকেও তিনি দিয়ে দিতে চান।কারণ তিনি জানতেন পেটে ক্ষুধা নিয়ে যেমন স্বাধীনতা আস্বাদন সম্ভব নয় তেমনই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যতীত কিছু নয়।কবি দুর্মর কষ্টের সাথে বলছেন।–

শুধু দুইবেলা দুই টুকরো পোড়া রুটি
পাই যদি সূর্যেরও আগে উঠি।
ঝড়ো সাগরের ঝুঁটি ধরে দিই নাড়া
উপড়িয়ে আনি কারাকোরামের চূড়া
হৃদয়ে বিষাদ চেতনা তুচ্ছ করি,
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মণি।

কবির আকাঙ্ক্ষা এখানে মানবতাবোধের উজ্জ্বল ধারায় প্রবাহিত একথা মেনে নিয়েও বলতে হয় কবি এখানে কিঞ্চিৎ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছেন।আহার যে কোন জীবের মতোই একটি প্রাকৃতিক চাহিদা।এখানে মানুষের সাথে অন্য জীবের পার্থক্য নেই।কিন্তু মানুষ সভ্য হয়ে সমাজ গঠন করেছে এবং সমাজতন্ত্র সেই সমাদের বুকে জন্ম নেওয়া একটি আধুনিক মতাদর্শ।সভ্যতার কোনো অর্থ থাকে না যখন মানুষের স্বাধীনতা থাকে না।সমাজতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ব্যক্তির স্বাধীনতা দান ও শোষিত বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তাই একজন সমাজতান্ত্রিক কবির মুখে স্বাধীনতা বিসর্জনের কথা কিছুটা ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়। আসলে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় কষ্টের অংশীদার হয়ে দেখেছেন তথাকথিত স্বাধীন হলেও প্রকৃত অর্থে তারা স্বাধীন নয়।যে স্বাধীনতা একমুঠো খাবার দিতে পারে না,অনাহারে থাকতে বাধ্য করে,শাসকের প্রচন্ড আক্রোশে খাদ্য চেয়ে আন্দোলন করলে গুলি খেতে হয়,মরতে হয় দাবী জানাতে গিয়ে সেই স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থেই অর্থহীন,অনাকাঙ্ক্ষিত।এই কবিতায় কবির মানবপ্রীতির দিকটি শতদলের মতো বিকশিত হয়েছে।

খাদ্য আন্দোলনর পটভূমিকায় রচিত তাঁর অপর একটি কবিতায় দেখা যায় স্বাধীন দেশে পরাধীনতার এক ভয়ঙ্কর ছবি।
১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে খাদ্য আন্দোলনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দেশে যে গোলা বর্ষণ হয়ছিল তাতে হতাহত হয়েছিল অনেক মানুষ।কবিও বামপন্থী নেতাদের সাথে খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়ছিলেন।শাসকের রক্তচক্ষু তিনি মেনে নিতে পারেননি। পুলিশের আক্রমনে শহীদ হয়ছিলন একাশি জন সাধারণ মানুষ।খাদ্য আন্দোলনের সেই ভয়ঙ্করতার চিত্র তাঁর কবিতায় পেয়েছে অশ্রুসজল বাস্তবতা।–

গুলি চলছে,গুলি চলছে,-গুলি চলবে-এই না হলে শাসন!
ভাত চাইতে গুলি,মিছিল করলে গুলি,বাংলা বন্ধ,
গুলির মুখে উড়িয়ে দেওয়া চাই।

তৎকালীন সরকার খাদ্য আন্দোলনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।আন্দোলন করল গুলি চালানো হতো।এমনকি শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট করার অনুমতিও ছিল না। সরকারের এহেন ফ্যাসিস্ট মনোভাব কবিকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়েছিল।চল্লিশের দশকের অন্যতম প্রখ্যাত কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের আমন্ত্রণে কবি বিপ্লববাদী সমাজতান্ত্রিক দলের মুখপত্রে কাজ করেছিলন। সেই সময়ের প্রতিটি ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন।আসলে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা লাভের কিছু পূর্বেই সারা বিশ্বে ফ্যাসিবাদের অবসান ঘটে।জনযুদ্ধের অনুপ্রেরণায় ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কলঙ্কমুক্ত হয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে।একদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেনির উল্লেখযোগ্য জয়লাভ অন্যদিকে দীর্ঘ দুশো বছরের বেশি ঔপনিবেশিক শাসনের কবলমুক্ত হওয়া স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষকে দারুণ আশাবাদী করে তুলেছিল।সাধারন মানুষ আশা করেছিলেন নবগঠিত সরকার এক সুখী সমৃদ্ধ আত্মনির্ভর প্রগতিশীল সমাজ গঠন করবে।কিন্তু কার্যত দখা গেল সরকার জনগনের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে দুরত্ব তৈরি করতে শুরু করল।সরকার খ্যাদ্য আন্দোলনের উপর গুলি চালিয়ে বর্বর ফ্যাসীবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে শুরু করল। কবি তাই আক্ষেপ করে লিখেছিলেন,যে জনগন পুলিশকে মাইনে দেয়,বন্দুক কেনার টাকা দেয় সেই পুলিশকেই ব্যবহার করে জগনের উপর সন্ত্রাস চালানো হয়।নিজের স্বার্থ কায়েম করতে গুন্ডা লেলিয়ে দেয় সরকার।এমন অকৃতজ্ঞ সরকার ও তার প্রশাসনকে মনে প্রাণে ঘৃণা করেছেন।প্রতিবাদে গর্জে উঠেছন।

দেশের মানুষ না খেয়ে দেয় ট্যাক্স
গুলি কিনতে,পুলিশ ভাড়া করতে
গুণ্ডা পুষতে ফুরিয়ে যায় তাই,
একেই বলে গণতন্ত্র।
এরই জন্য কবিতার সর্দার
সাহিত্যের মোড়লেরা কেঁদে ভাসান যখন
গুলিবিদ্ধ রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন,আমার ভাই।

কবি রাজনৈতিক দূরবৃত্তায়ন মেনে নিতে পারেননি।তিনি প্রগতিশীল চেতনায় লক্ষ্য করেছেন সাধারন নিরন্ন মানুষের অসহায় রূপটি।যে সব মহান কবি যাদের মোড়ল বা সর্দার হিসাবে চিহ্নিত করেছেন তাদের গনতন্ত্রের জন্য অহেতুক অনুশোচনাকেও প্রশ্ন বিদ্ধ করেছেন।অন্যয়ভাবে শাসনযন্ত্র করায়ত্ব করার জন্য পুলিশকে দিয়ে সাধারণ নাগরিকদের হত্যা করে,গুণ্ডা লেলিয়ে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে –এর চেয়ে রাজনৈতিক দুরবৃত্তায়ন আর কি হতে পারে? গনতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র চালাচ্ছে সরকার।শাসকের এই স্বৈরাচারী মানসিকতাকে তীব্র সমালোচনা করেছেন।

পৃষ্ঠা-৪

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গনতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল এবং তিনি প্রতিষ্ঠান বিরোধী নন। কিন্তু গণতন্ত্রের জিগির তিলে যারা স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র কায়েম করে গনতন্ত্রকে অপমৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে তিতে চান তিনি তাদের প্রতিই খড়্গহস্ত হয়েছন।তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী।সমাজতন্ত্র সর্বদাই গনতন্ত্রের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে।তিনি চেয়েছেন প্রকৃত গনতন্ত্র আসুক,শেষ হোক গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র।ভোটের নামে যে প্রহসন গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দিচ্ছে তার নিবৃত্তি তিনি 'চিড়িয়াখানা' কবিতায় স্পষ্টভাবে মিথ্যাচার আর ভণ্ডামিতে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক নেতাদের ভোট দিতেই বারণ করেছেন।তিনি নেতাদের গাধা ও হাতির সঙ্গে তুলনা করেছেন।

ভোট দিওনা হাতিকে
ভোট দিওনা নাতিকে।
ভোট দিওনা গাধাকে
ভোট দিওনা দাদাকে।

আসলে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন রাজা আসে রাজা যায় কেবল তাদের বহিরাঙ্গিক চেহারার পরিবর্তন করে মাত্র।কিন্তু এরা কেউই চায় না গরীব অসহায় ক্ষুধার্ত মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে।রাজার পর রাজা আসে,কেউ নীল তো কেউ লাল জামা পড়ে কিন্তু সর্বহারা মানুষগুলি একইভাবে অতলান্ত অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকে। অর্থহীন ভাবেই বেঁচে থাকে গণতন্ত্রের মহান মানবসম্পদ হিসাবেই।

রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ঐ রাজা যায়,
জামা কাপড়ের রঙ বদলায়
দিন বদলায় না।

কবি মারক্সীয় সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।তিনি বিশ্বাস করেছিলেন তার দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সাধারণ মানুষের উন্নতি হবে।কিন্তু সেই বিশ্বাসের পতন ঘটে যখন কমিউনিস্ট দল ক্ষমতায় থাকার পরও সাধারন মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি উন্নতির জন্য তেমন লক্ষ্য দেওয়া তো দূরের কথা বরং একশ্রেণীর ছদ্ম সমাজতন্ত্রীদের সীমাহীন লোলুপতা কবিকে বীতশুদ্ধ করে তুলেছিল।শাসকের আসনে যেই বসুক তার চরিত্রের আদতে কোনো পরিবর্তন হয়না।

গোটা পৃথিবী গিলে খেতে চায় সেই যে ল্যাংটো ছেলেটা
কুকুরের সাথে ভাত নিয়েতার লড়াই চলছে চলবে।
পেটের ভিতর কবে যে আগুন জ্বলছে,এখনো চলবে।

কবি মনে প্রাণে চাইতেন এই শোষণমূলক সমাজের দ্রুত অবসান হয়ে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা।কিন্তু কোনো রাজাই এই কাজটি করে না।কেননা শাসকদলগুলি জানে যদি দেশ থেকে দারিদ্র ক্ষুধা অশিক্ষা সমাজ থেকে দূরীভূত হয় গেলে রাজনীতির পরিসর কমে যাবে।সেই কারনে ইস্তেহারে থাকলেও দরিদ্র বিমোচন হয়না।তাই কবি মুখোশটাকেই মুখ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।রাজা আসে রাজা যায় তবু অসহায় মেহের আলির অবস্থা একই থেকে যায়।

রাজা আসে যায় আসে আর যায়
শুধু পোষাকের রঙ বদলায়
শুধু মুখোশের ঢং বদলায়
পাগলা মেহের আলি
দুই হাত দিয়ে দেয় তালি
এই রাস্তায় ঐ রাস্তায়
এই নাচে ওই গান গায়
সব ঝুট হ্যায়!সব ঝুট হ্যায়!সব ঝুট হ্যায়!
পৃষ্ঠা -৫

স্বাধীনতা পরবর্তী গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের এই স্বার্থপর অবক্ষয়ের কদর্য রূপ দেখে কবি যে কতখানি মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন তা এখান থেকে প্রকাশ পায়।বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গ দেশের কৃষক রমা কৈবর্তয় ও হাশেম শেখ সেদিনও যেমন ছিল বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মেহের আলিও তেমনই আছে, কেবল সময় বদলেছে রাজা বদলেছ।সাধারন মানুষের অবস্থার পরিবর্তন ঘটেনি।'জননী জন্মভূমি' কবিতায় জন্মভূমি ভারতবর্ষকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন।

সব দেখে সব শুনেও অন্ধ তুমি
সব জেনে বুঝেও বধির তুমি
তোমার ন্যাংটো ছেলেটা,
কবে যে হয়েছে মেহের আলি।
কুকুরের ভাত কেড়ে খায়
দেয় কুকুরকে হাততালি
তুমিও বদলাও না
সেও বদলায় না,
শুধু পোষাকের রঙ বদলায়
শুধু পোশাকের ঢং বদলায়।

পোশাকের রঙ বদলালেও বদলায় ণা যন্ত্রণার আবোহ।শাটাড়োন খেটে খাওয়া মানুষদের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি,ভারত বর্ষের এহেন অবস্থার কারন রাজনৈতিক নেতাদের মুখ আর মুখোশের পার্থক্য কেই দায়ী করেছেন। মুখোশের অন্তরালে আসল মুখটিকে লুকিয়ে রাখে নেতা থেকে সাধারণ মানুষ প্রায় সকলেই।নেতাদের স্বার্থপরতা,কথা ও কাজের অমিল দেখে কবি আশাহত হয়েছেন।যুবক যুবতীদের উদ্দেশ্যে কবি তাই

বলেছেন রাজনীতির পিছনে না ছুটে,নেতাদের পদলেহন না করে এগিয়ে যেতে হবে গন্তব্যে।

হে যুবক যুবতী পৃথিবীতে তোমাদের দাম কতটুকু,
কান্নাকে শরীরে নিয়ে কার ঘরে কয় ফোঁটা ডীয়ে গেলে আলো।

'উত্তরপাড়া কলেজঃ হাসপাতাল'কবিতায় শিক্ষিত যুবক যুবতীদের নকশাল আন্দোলনে যোগদিয়ে মানুষ হত্যার ঘৃণ্য মানসিকতাকে এবং তথাকথিত নকশাল আন্দোলনের বিপথগামীতাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন।উদ্দেশ্যহীন জঘন্য মতাদর্শকে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বলে চালানোর তীব্র বিরোধিতা করছেন তিনি।মানুষ হত্যার মধ্যদিয়ে কখনোই শোষন হীন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব নয়।একমাত্র প্রকৃত গন অভ্যুত্থানই পারে যথার্থ বিপ্লব এনে দিতে।এই কবিতায় কবি নকশাল আন্দোলনের বীভৎস চেহারাটি মর্মান্তিক ভাষায় তুলে ধরেছেন।

রক্ত রক্ত শুধু রক্ত,দেখতে দেখতে দু চোখ অন্ধ হয়ে যায়
শিক্ষক ছাত্রের রক্ত প্রতিটি সিঁড়িতে,ঘরে চেয়ারে চৌকাঠে বারান্দায়
দরজা ভাঙ্গা,জানলা ভাঙ্গা,ছাদের কার্নিশ ভাঙ্গা
তাতে ছাত্রের মাথা ঠুকে ঠুকে তারা খসিয়েছে চুন সুরকি
কেউ লাফ দিয়েছে বিশ ফুট নীচে ,কাউকে ছুঁড়ে দিয়েছে
রক্তবমি করে আজ হাসপাতালে এই বাঙলার কিশোর গোঙায়,
এই তোমার রাজত্ব,খুনি তার উপর কি বাহবা চাও
আমরাও দেখবো,তুমি কতদিন এভাবে রাক্ষস নাচাও।

কমিউনিস্টদের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকে তৎকালের ক্ষমতাধীন শাসকদল নকশালী সন্ত্রাসীদের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে এক পরিকল্পিত হত্যালীলায় মেতে উঠেছিল।রাতের অন্ধকারে দিনের আলোয় তরতাজা যুবক যুবতীদের হত্যা করে ভীতির পরিবেশ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল।কবি এই গৃধ্নুতার প্রতি তীব্র ঘৃনা পোষণ করছেন ও প্রতিবাদ করেছেন।ব্যথিত হয়েছেন রক্তের স্রোত দেখে।

পৃষ্ঠা -৬

'আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে'-কবিতায় একরাশ ঘৃনা আর প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন।

যে আমি তোমার দাস;কানাকড়ি দিয়ে
কিনেছ আমাকে রানী,বেধেছ শৃঙ্খলে
আমার বিবেক লজ্জা,যে আমি বাংলার
নেতা কবি সাংবাদিক,রাত গভীর হলে
গোপনে নিজের সন্তানের ছিন্নশির
ভেট দেই দিল্লিকে, গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে
ভোরবেলা কেঁদে উঠি হায়
আত্মঘাতী শিশুগুলি রক্তে আছে শুয়ে!

দিল্লির চক্রান্তে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের সরকার এইসব হত্যা সংঘটিত করেছিল বলে কবি মনে করেন।খুনকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে কৃত্রিম লোকদেখানো কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনের মেকী নাটকের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।নেতাদের মুখোশের আড়ালে আসল চেহারাটি তিনি নিরাভরণ ভাষায় প্রকাশ করেছেন অশ্রুসজল অভিব্যক্তিতে।সেই সময়ের বুদ্ধিজীবি কবিদের নীরবতাকে তিনি কটাক্ষ করেছেন।অন্যায়ের প্রতিবাদ করে ন্যায়বিচার যাদের কলমে উঠে আসে তারাই আজ নীরব।তাদের নীরবতা কবি মেনে নিতে পারেনি।

কবিরা আজ কোথায় সবাই কী দুর্যোধনের কেনা,
নাকি বিরাট রাজার ক্রীতদাস।

কবি দেখেছেন দেওয়ালে যারা বিপ্লবের বানী লিখে লিখে ক্ষমতায় আসে তারাই আবার পরবর্তীকালে বিপ্লবকে নিজেদের কুক্ষিগত করে স্বৈরাচারী শোষণ চালায়।দেওয়ালে লেখা বিপ্লবের বাণী গুলিকে তখন অশ্লীল প্রলাপ বলে মনে হয়।শ্রেনী সংগ্রামের পোষ্টার গুলি দেওয়াল থেকে ছিঁড়ে ফেলতে চায় সেইসব তথাকথিত বিপ্লববাদী শাসকেরা।গুন্ডা,পুলিশ দিয়ে সন্ত্রাস চালিয়ে বাকস্বাধীনতা পর্যন্ত হরণ করে নেয়।এক্ষেত্রে কোনো দল কোনো মতাদর্শের কোনো শাসকের কোনো ব্যতিক্রম নেই,হবেও না কোনোদিন।যাদের আত্মত্যাগ ও বলিদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসে তাদেরও ভুলে যায়।শহীদর প্রাপ্য মর্যাদা টুকুও দেয়না।

একবার সিংহাসনে উঠে বসতে পারলে
তখন দেওয়ালেড় লেখাগুলি অশ্লীল প্রলাপের মতো মনে হয়।
তখন অপরের পোস্টার ছেঁড়াই শ্রেণী সংগ্রামের কাজ,

অথবা ডজন খানেক মন্ত্রী জড়ো করে রাস্তায় বক্তৃতা দেওয়া,
সাবধান! যারা দেওয়ালকে কলঙ্কিত করছ, তোমাদের পিছনে,
এবার গুন্ডা লেলিয়ে দেব।
এখন থেকে বাংলাদেশের তামাম দেয়ালগুলোকে
নতুন করে চুনকাম করে দেবে,কোথাও যেন কোন
গুলি খাওয়া মানুষের রক্ত
ছিটে ফোঁটাও দাগ না রাখে।

বামপন্থী সমাজতন্ত্রবাদীদের বিপরীতধর্মী আচরণকে কবি মেনে নিতে পারেননি।শতশত আদর্শবাদী তরুণ তরুণীর আত্ম বলিদানে যখন পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তারাও মানুষের প্রতিবাদের প্রতিরোধের ভাষা কেড়ে নিতে পিছপা হয়নি।ভুলে গিয়েছিল শত শত শহীদের রক্তের কথা।আপন চিন্তায় মগ্ন রাজা একই রয়ে গেল।রাজা প্রজার দুরত্ব ক্রমেই বাড়িয়ে দিতে লাগলো।এই নীতিভ্রষ্ট বামপন্থীদের সভা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন কবি।'জন্মভূমি আজ'- কবিতায় কবি বিপ্লববাদ এবং গনচেতনার কথা বলেছেন। তিনি যেখানেই রন,রক্ত,বৈষম্য,অত্যাচার দেখেছেন সেখানেই গর্জে উঠেছেন।

পৃষ্ঠা -৭

তাঁর প্রতিবাদ শতকণ্ঠে উচ্চকিত হয়েছে।কিন্তু তিনি কখনোই নৈরাজ্যকে প্রশ্রয় দেননি।অন্যান্য বামপন্থী কবিদের মতোই তিনি আশাবাদের চেতনায় প্রোজ্জ্বল ছিলেন। 'জন্মভূমি আজ'-কবিতায় তার সেই আশাবাদ গনচেতনা অ গণআন্দোলনের ভাষায় ব্যক্ত করেছন।কবি জানেন আন্দোলন অ প্রতিবাদের শেষ হয়না।শাসকের অন্ধচক্ষু খুলে দিতে বারবার আন্দোলন ও প্রতিবাদ জারি রাখতে হবে।কবি উপলব্ধি করেছেন রাত্রি এখনো শেষ হয়নি।তাই অন্ধকার ভেদ করে আলোর উৎসে পৌছুতেই হবে।এর জন্য চাই গণআন্দোলন ও গণচেতনার উদ্বোধন।

মানবতাবাদী কবি জানেন মানুষের হাত ধরেই এগিয়ে যেতে হবে।সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পদানত করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে হবে।এরজন্য কোনো সহজ উপায় নেই।ঐক্যবদ্ধ হয়ে গনঅভ্যুত্থান গড়ে তুলতে হবে।যদি বিপ্লবের মন্ত্র ভুলে যায় তবে আর পরিবর্তন সম্ভব হবেনা।তাই বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে গেলে হবেনা। কর্ম প্রেরণা ও জনচেতনার মধ্য দিয়েই লক্ষে এগিয়ে যেতে হবে।অসহায় দরিদ্র নিরন্ন মানুষ তার প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে।–

মাটিতো আগূণেড় মতো হবেই
যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো
যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি
যে মানুষ গাইতে জানে না।
যখন প্রলয় আসে,সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায়
তুমি মাটির দিকে তাকাও,সে প্রতীক্ষা করছে
তুমি মানুষের হাত ধরো,সে কিছু বলতে চায়।

আসলে মানবতাবাদী কবির কাছে মানুষই শেষ সত্য।সাধারন মানুষকী সঙ্গে নিয়েই বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা রচনা করা উচিত বলেই তিনি মনে করেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১।সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,কুন্তল চট্টোপাধ্যায়।
২।আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দীপ্তি ত্রিপাঠি।
৩।কথাসাহিত্যে মন্বন্তরের দিনগুলিতে, সুব্রত রায় চৌধুরী।
৪।স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস(১৮৫৫-১৯৪৭),অমলেশ ত্রিপাঠি।
৫।সমাজতত্ত্ব,পরিমল ভূষণ কর।
৬।অবিভক্ত বাংলার কৃষক সমাজ,সুস্নাত দাস।
৭।আধুনিক বাংলা কবিতার চালচিত্র,সুমিতা চক্রবর্তী।
৮।Povrty and Femines:An Essay on Entitlement and Deprivation(1981),Dr. Amartya Sen
৯।The Horizon,M.K.Gandhi.